## মডিউল-২৮

সেমিস্টার-IV

**কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-10**

**কোর্স নাম -বাংলা কাব্য কবিতা**

**মিলন মণ্ডল**

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

**পর্ব-১ কবিতা-'ঐক্যতান' –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

বিন্যাসক্রম

২৮.১ উদ্দেশ্য
২৮.২ প্রস্তাবনা
২৮.৩ মূলপাঠ: ঐক্যতান-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৮.৪ সারাংশ
২৮.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী
২৮.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী
২৮.৭ উত্তর সংকেত

### ২৮.১ উদ্দেশ্য

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের পর্যায়গুলি সম্পর্কে জানবে।
- 'ঐক্যতান' কবিতাটির উৎস সম্পর্কে জানবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে জানবে।
- কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে।
- 'ঐক্যতান' কবিতার ভাব, ভাষা ও নানা প্রকার শব্দার্থ সম্পর্কে জানতে পারবে।

### ২৮.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠের ফলে পাঠক-পাঠিকারা কবি রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের কাব্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন। 'ঐক্যতান' কবিতাটির উৎস সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি 'জন্মদিনে' কাব্যটির সঙ্গেও তারা পরিচিত হবেন। অতিবৃদ্ধ অশক্ত কবির নানা প্রকার ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এই অন্ত্যপর্বের প্রান্তিক (১৯৩৮), সানাই (১৯৪০), নবজাতক (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১),

জন্মদিনে (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থগুলিতে। বার্ধক্য কবিরে লেখনিকে থামাতে পারেনি। বরং আরো সজীব মন ও উজ্জ্বল প্রাণশক্তির নিদর্শন এই কাব্যগুলির নানা কবিতায় ধরা পড়েছে। তিনি বার্ধক্য ও ব্যাধির আক্রমণকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে করে প্রায় বারোখানি কাব্য রচনা করেছেন। তেমনি একটি কাব্য হল 'জন্মদিনে'। এই সমস্ত কব্যগুলিতে কবি খণ্ড-অখণ্ডের মধ্যে, বাস্তবের সঙ্গে ইতিহাসের আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের মিল ঘটিয়ে নিজেকে 'পৃথিবীর কবি' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছেন। মানুষের কাছে, মানুষের পাশে থাকতে চেয়েছেন। 'ঐক্যতান' কবিতাটির মধ্যে কবির সেই সুরই ধ্বনিত হয়েছে। কবি ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িযে সারা বিশ্বের দরবারে ভারতের বিজয় পতাকা ওড়াতে চেয়েছেন। জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছেন। কবির মানবপ্রেম-বিশ্বপ্রেমে উন্নীত হয়েছে। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের বরণ', 'পথের শেষে' কবিতা দুটির মধ্যে আমির আমিত্ব ধারাকে ধরাভূমে মিলাতে চেয়েছেন।

## ২৮.৩ মূলপাঠ: 'ঐক্যতান'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে-
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াই আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পানি ভিক্ষালব্ধ ধনে।
আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধণায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক-
রয়ে গেছে ফাঁক।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ-
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির-বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার-
প্রাণীহন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধান,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরু ভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়-
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

## ২৮.৪ সারাংশ

'ঐক্যতান' কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এর বেশীর ভাগ কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। 'ঐক্যতান' কবিতাটি ১৮ই জানুয়ারি ১৯৪১ সালে লেখা হয়। শান্তিনিকেতনে। আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে কবি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা মিল ঘটাতে চেয়েছেন। নদী-পাহাড়-মরু—নানা প্রকার জীব পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা তাদের সবটা চিনি না বা জানি না। জানা-অজানা তথ্যের উপর ভর করে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়কে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কবি বিশ্বের যেখানে যা কিছু ভালো রয়েছে তাকে ভারতবাসীর জন্য কুড়িয়ে আনেন। আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভরিয়ে চলেছেন। কবি আর ভারতবর্ষের কবি রূপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তাই তিনি নিজেকে—''আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। কবির বাঁশির সুরে সারা বিশ্ব আজ জেগে উঠবে। কবির মনে একটা খেদ কাজ করছে। তাঁর এ জন্মের কর্মফল, সকলে হয়তো পেল না। কবির বাণী সকলের কানে পৌঁছালো না। উত্তরমেরু-দক্ষিণ মেরু মানুষদের কাছে কবির সৃষ্টির সুর অজ্ঞাত থেকে গেছে। নব নব সুরবাণী সৃষ্টি করেই কবিরা আনন্দ পান। সেই আনন্দের ভোগ নিয়েই কবিরা সন্তুষ্ট থাকেন। কবি তাই বলেছেন—'সঙ্গ পাই সবাকার লাভ করি আনন্দের ভোগ/ গীত ভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ/ নিখিলের সংগীতের স্বাদ।''

চারটি পর্যায়ে বিভক্ত কবিতাটি রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ের বিখ্যাত কবিতা। কবি তাঁর আমিত্ব ভাবনাকে বিশ্বচরাচরে এক করতে চেয়েছেন। তাঁতিরা তাঁত বোনে, চাষিরা ক্ষেতে হাল চালায়, জেলেরা জলে জাল ফেলে, জীবনের এই কর্ম বিভাজন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সামাজিক কারণের মধ্যেই সমাজ ব্যবস্থা টিকে আছে। কবি তাই উচ্চমঞ্চে বসেও নিম্নের কথা ভোলেন নি। জীবনের সাফল্য ব্যর্থতার পিছনে নানা নিন্দার কথা থাকতে পারে। সে নিন্দা যদি গঠনমূলক হয়, কবি তাকেও মেনে নেন। কবির সৃষ্টির বিচিত্র পথগামী হয়তো হয়নি, হয়নি সে সর্বত্রগামী তবুও কবির বিশ্বাস একদিন সত্যের জয় হবেই। শুধু ভঙ্গি দিয়ে বা চুরি করে কিছুদিন ভালো থাকা যায় সকলের কাছে। তবে তা সারা জীবন নয়। কবির মনের জটিলতা ধীরে ধীরে মুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের রীতি-সংস্কারের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দেশের রীতি সংস্কারের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। সাহিত্য, সংগীতই পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যতান ঘটাতে। তাই তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টিকে মানুষের কাজে, মানুষের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সমস্ত সৃষ্টিকর্তারা যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান পান— তাই কবির বড় চিন্তা। অন্যের খ্যাতিতে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারলে তবেই প্রকৃত শিল্পীর জয় সাধিত হবে। তাই আশা রেখেই ঐক্যতান কবিতায় কবি জগৎ মাতাকে, সৃষ্টি কর্তাকে নমস্কার করেছেন। কবিতাটির গঠন বিন্যাসে দেখা যায় চারটি স্তবকে রচিত হয়েছে। নানা প্রকার শব্দের ব্যবহারে কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি রচিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তার কাছে কবির কাতর প্রার্থনা অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে জগৎ সভায় ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। খণ্ড খণ্ড

সত্তাকে অখণ্ড সত্তায় পরিণত করতে হবে তবেই হবে প্রকৃত শিল্পীর জয়।

## ২৮.৫ আগর্শ প্রশ্নাবলী

১ (ক) 'ঐক্যতান' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
(খ) 'ঐক্যতান' কবিতা কত সালে, কোথায় কবি রচনা করেন?
(গ) 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল কত?
(ঘ) 'ঐক্যতান' কবিতায় কবি নিজেকে 'কাদের কবি' বলে দাবী করেছেন?
(ঙ) 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতার নাম লিখুন।
২। (ক) কবিতাটির মূলভাব কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

## ২৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–সঞ্চয়িতা
২. ড. সুকুমার সেন–ভাষার ইতিবৃত্ত।
৩. ড. রামেশ্বর শ–সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।
৪. ড. জীবেন্দু রায়–বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলা ভাষা পরিক্রমা।

## ২৮.৭ উত্তর সংকেত

১। (ক) জন্মদিনে (খ) ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪১, শান্তিনিকেতন। (গ) ১৯৪১ সালে।
(ঘ) পৃথিবীর কবি বলে (ঙ) বরণ, পথের শেষে।
২। (ক) ২৮.৪ অংশ দেখুন